ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত দার্শনিক যুক্তিসমূহ খন্ডন

অ ন ন্ত

ananta@inbox.com

২১শে নভেম্বর, ২০০৬

পূর্ববর্তী প্রকাশের পর .....

(৩) সত্তাবিষয়ক প্রমাণ (Ontological Argument) :-

অনেকে সত্তাসংক্রান্ত প্রমাণটি (কেউ কেউ একে তাত্ত্বিক প্রমাণ বলেও উল্লেখ করে থাকেন) ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত অন্যান্য প্রমাণের (বিশ্বতাত্ত্বিক এবং উদ্দেশ্যবাদী প্রমাণ) মতো অভিজ্ঞতাভিত্তিক নয় বরং অভিজ্ঞতা পূর্ব বলে মনে করে থাকেন । দর্শন শাস্ত্রে দুটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে অভিজ্ঞতাপূর্ব (**Apriori**) এবং অভিজ্ঞতালব্দ (**Aposteriori**)। কোনো কোনো ভাববাদী দার্শনিকগণ (প্লেটো, বার্কলে, কান্ট) মনে করেন, আমাদের জ্ঞান দুভাগে বিভক্ত ; একটি হচ্ছে অভিজ্ঞতালব্ধ এবং অপরটি হচ্ছে অভিজ্ঞতাপূর্ববর্তী। যে জ্ঞান আমরা আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয় শক্তি ব্যবহার করে অর্জন করতে পারি, তাই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। কিন্তু তাঁরা বলেন, সঠিক জ্ঞান পঞ্চইন্দ্রিয়শক্তির ব্যবহারে অর্জন করা যায় না; আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির সীমাবদ্ধতার জন্য ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান চরম সত্যের জ্ঞানদানে সক্ষম নয়। ফরাসি দার্শনিক, গণিতজ্ঞ রেনে দেকার্ত (**Rene Descartes : 1596-1650**) মনে করেন, "ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান, সত্তার দৃষ্ট প্রকাশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। এরূপ অর্জিত জ্ঞান সত্তার 'নিজ সত্তায় অবস্থিত বস্তুর' যথার্থ জ্ঞান নয়। কিন্তু নিজ সত্তায় অবস্থিত বস্তুই হচ্ছে চরম সত্তা। এই চরম সত্তার জ্ঞান কেবল অভিজ্ঞতার বাইরে কেবল অনুভূতির মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব।" বর্তমানে কেউ কেউ এই অতিকল্পিত অলৌকিক অভিজ্ঞতাপূর্ব অর্জিত জ্ঞানকে "ষষ্ঠইন্দ্রিয় (**Sixth Sense -?**)" দ্বারা লব্ধ জ্ঞান নামে অভিহিত করে থাকেন। তবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী (**Dialectical Materialism**) দর্শনে জ্ঞানকে এরূপ অভিজ্ঞতালব্ধ এবং অভিজ্ঞতা-পূর্ববর্তী বলে বিভক্ত করার তীব্র বিরোধী। বস্তুবাদী দার্শনিকগণ বলেন, অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম; অভিজ্ঞতাপূর্ব বলে জ্ঞানের অন্য কোনো মাধ্যম নেই।

(Saint Anselm : 1033-1109)

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সত্তাবিষয়ক প্রমাণটি সংক্ষেপে উপস্থাপন করলে দেখা যায় : মানুষের মনোগত ধারণাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব (বাস্তব বা বস্তুগত) প্রমাণের জন্য যথেষ্ঠ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক এই তাত্ত্বিক বা সত্তা বিষয়ক প্রমাণটি প্রথম উপস্থাপন করেছিলেন মধ্যযুগে ইংল্যান্ডের ধর্মতাত্ত্বিক সেন্ট এনসেল্ম (***Saint Anselm***) তাঁর প্রস্লজিয়ান (***Proslogion***) গ্রন্থে। মধ্যযুগে যখন অন্ধধর্মীয় বিশ্বাস ও গোঁড়ামির প্রাবল্য খ্রিষ্টিয় সমাজে প্রচলিত হচ্ছিল, এনসেল্মই তখন এর মধ্যে যুক্তির ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। তখনকার প্রচলিত বিশ্বাস - "**যুক্তি মাত্রই ধর্মীয়বিশ্বাসকে বিনষ্ট করে**" - এধারণার তিনি প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি বলেন :- "যুক্তি বিশ্বাসকে বিনষ্ট করবে, এমন কোনো কারণ নেই। বরং যুক্তি ধর্মীয় বিশ্বাসকে দৃঢ়তর হতে সাহায্য করে। ..... তিনি আরো বলেন, জ্ঞানের জন্যই আমি বিশ্বাস করি। অন্ধবিশ্বাস জ্ঞানকে সাহায্য করে না। তাই অন্ধবিশ্বাস নয়, যুক্তির উপর ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।" বলা যায় যে, এনসেল্মের এমন বৈপ্লবিক অভিমত প্রসারের কারণেই মধ্যযুগে ইউরোপে খ্রিষ্টীয় ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্ক প্রয়োগের একটি ঐতিহাসিক ধারার সূচনা হয়, যা স্কলাসটিসিজম (**Scholasticism**) বা পান্ডিত্যবাদ নামে পরিচিত।

এনসেল্ম (**Anselm**) মনে করেন, ঈশ্বরের ধারণা তাঁর অস্তিত্বের নির্দেশক। ঈশ্বরের ধারণা বলতে এমন একটি ধারণাকে বুঝায় যার চেয়ে বড় অন্য কিছুর কল্পনা করা যায় না। অর্থাৎ ঈশ্বরের ধারণা পরিপূর্ণ এক সত্তার ধারণা। ঈশ্বর যদি অস্তিত্বশীল না হতেন, তাহলে এই ধারণা সর্ববৃহৎ চিন্তনীয় সত্তার ধারণা হতো না। তখন এই ধারণা সর্ববৃহৎ চিন্তনীয় সত্তার ধারণা হতো না; এর চেয়েও বড় অন্য কিছুর অস্তিত্বশীল হওয়া সম্ভবপর হতো। যে সত্তার অস্তিত্ব আছে তার ধারণা, অস্তিত্ব নেই এমন সত্তার ধারণার চেয়ে অধিকতর পূর্ণসত্তার ধারণা। সুতরাং বলা যায় যে, একটি পরিপূর্ণ সত্তা হিসেবে ঈশ্বর অবশ্যই অস্তিত্বশীল!! নিরীশ্বরবাদী (**Atheist**)'দের মনেও ঈশ্বরের ধারণা থাকতে বাধ্য। কারণ, তা না হলে ঈশ্বর বলতে কী বোঝায়, এটাই যদি সে না বুঝতো, তবে তাঁর অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে যাওয়া তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতো?

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত সত্তাবিষয়ক প্রমাণে ঈশ্বরের ধারণা অনেকটা বস্তুগত ধারণা। এটা এমন এক সত্তার ধারণা, যার থেকে বড় কিছু হতে পারে না বা থাকতে পারে না। এই ধারণাটা দুরকম হতে পারে; যেমন : (১) সেইসব ধারণা, যার কেবল মনোগতভাবে সত্য, যেহেতু মনের বাইরে তাদের কোনো বস্তুগত সত্তা নেই। (২) সেই সব ধারণা, যা মনোগতভাবে সত্য ও বস্তুগতভাবেও সত্য।

(Rene Descartes : 1596-1650)

আধুনিক কালে ফরাসী দার্শনিক রেনে দেকার্ত (**Rene Descartes**) তাঁর ***Meditations on First Philosophy*** গ্রন্থে নতুন রূপে এই যুক্তিটি অবতারণা করেন দুটি আকারে। যেমন : **প্রথম আকার** হচ্ছে, ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে তাঁর অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে যুক্ত। যেমনি করে যুক্ত ত্রিভুজের ধারণার সাথে; তিনকোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

দ্বিতীয় আকার হচ্ছে, কারণ ছাড়া কার্য হয় না এবং কারণে ততটুকু সত্তা থাকবে যতটুকু কার্যের মধ্যে আছে।

দেকার্তের দ্বিতীয় আকারটি একটু ব্যাখ্যা করা যাক। আমাদের মনে ঈশ্বরের ধারণা আছে, তখন সেটা নিশ্চয়ই একটা কার্য বা ঘটনা। যেহেতু কারণ ছাড়া কার্য হয় না, সুতরাং আমাদের মনে ঈশ্বরের ধারণা উৎপত্তিরও একটা কারণ থাকা দরকার। এবং সেই কারণটি হচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব। আবার ঈশ্বরের ধারণা একটি অসীম ও পূর্ণবস্তুর ধারণা। এই জগতে যেহেতু এমন কোনো বস্তু নেই যা অসীম ও পূর্ণ ; অতএব এই অসীম ও পূর্ণের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে এমন কারো দ্বারা যিনি বাস্তবিকই অসীম ও পূর্ণ। সুতরাং অসীম ও পূর্ণ এক ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে!!

সত্তাবিষয়ক প্রমাণ/ যুক্তি/ বক্তব্যসমূহ খন্ডন :

(১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত সেন্ট এনসেল্‌মের সিদ্ধান্তের মধ্যে বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অবশ্য হেতুবাক্য (Premise) থেকে যৌক্তিকভাবে নিঃসৃত হয়না। তাঁর বক্তব্য থেকে এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, আমরা যখন কোনো বস্তুকে অস্তিত্বশীল ভাবি, তখন এই অস্তিত্বশীল সত্তাটি অন্য কোনো অস্তিত্বশীল নয় (অনস্তিত্বশীল) এমন একটি সত্তার থেকে বেশ পরিপূর্ণ ধারণা। কিন্তু এনসেল্‌ম কখনোই একথা প্রমাণ করেননি যে, **ঈশ্বর অস্তিত্বশীল**। তিনি শুধু বলছেন, কাল্পনিক ঈশ্বরের ধারণার চেয়ে অস্তিত্বশীল ঈশ্বরের ধারণা অধিকতর পরিপূর্ণ। তবে এনসেল্‌মের এই ধরনের সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত অনুপপত্তি (Fallacy) গুলো খুব সুন্দর করে তুলে ধরেন গৌনিলো (**Gaunilo**) নামক Marmoutier এর এক সন্ন্যাসী (Monk), তাঁর "**প্রসলজিয়ানের যুক্তির বিরুদ্ধে**" নামক গ্রন্থে। তিনি বলেন, "*চিন্তার মাধ্যমে মস্তিষ্কে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের সত্তা এবং মস্তিষ্কে অধিষ্ঠিত অন্যান্য সত্তার মধ্যে তেমন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু এনসেল্‌ম যেভাবে পূর্ণস্বভাব ঈশ্বরের অস্তিত্ব*

প্রমাণ করেছেন শুধুমাত্র একটি ধারণা থেকে, ঠিক একই যুক্তিতে যে কেউ একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীপের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন। কেউ যখন একটি পরিপূর্ণ দ্বীপকে চিন্তনীয় সর্ববৃহৎ দ্বীপ বলে সংজ্ঞায়িত করবে, তখন এনসেল্‌মের যুক্তি মতে তো ঐ দ্বীপটিও অস্তিত্বশীল হবে!!"

এই ধরণের যুক্তিতে শুধুমাত্র গৌনিলোর দ্বীপের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয় না, বরং জ্বীন-ভূত-প্রেত-পরী- দৈত্য-দানো, হাঁসজারু, পক্ষিরাজঘোড়া, সোনার-পাথরবাটি ইত্যাদি ইত্যাদির কোনো বাস্তব অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও এদের প্রমান করা যায়!! যে কোনো সত্তা সম্পর্কে সর্ববৃহৎ কিংবা সর্বকনিষ্ঠ ধারণা তৈরি করতে পারলেই কি এই সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়? না। বরং এটা একটা চূড়ান্ত ভুল সিদ্ধান্ত। তাছাড়া এনসেল্‌মের বক্তব্যের জবাবে ইমান্যুয়েল কান্ট বলেন, " *কোন কিছুর ধারণা থেকে আমরা কখনো তার অস্তিত্বকে নিঃসৃত করতে পারি না। কারণা, ধারণা যেসব উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত, অস্তিত্ব সেগুলোর অন্তভুক্ত নয়।*" জে. জে. সি. স্মার্ট, গিলাবার্ট রাইল, এন্টনি ফ্লু ও জে. এন. ফিন্ডলে প্রমুখ বিশ্লেষণীদার্শনিকগণ কান্টের এই বক্তব্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে, " *অস্তিত্ব কোন গুণ নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নামক গুণ আছে- এ ধরণের কথা উদ্ভট। ঈশ্বরে আবশ্যিক অস্তিত্ব আরোপ করার অর্থ তাতে এমন একটি গুণ আরোপ করা, যা ঈশ্বরের থাকতে পারে না। অর্থাৎ ঈশ্বর অস্তিত্বশীল- এ উক্তি শুধু অসত্যই নয়, স্ববিরোধীও বটে।*"

(২) এনসেল্‌মের আরেকটি বক্তব্য হচ্ছে, " নিরীশ্বরবাদীদের (Atheist) মনে ঈশ্বরের ধারণা থাকতে বাধ্য। কারণ তা না হলে, ঈশ্বর বলতে কী বোঝায়, এটাই যদি সে না বুঝতো, তবে তাঁর অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে যাওয়া তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতো?" এই বক্তব্যের উত্তর একটু অন্যভাবে দেয়া যাক। আমরা প্রায়ই জ্বীন- ভুত-প্রেত-দৈত্য-দানো-পরী-হাসজারু ইত্যাদি কাল্পনিক নাম শুনে থাকি। আজকের এই স্যাটেলাইটের যুগেও কেউকেউ এগুলোর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে থাকেন। তবে বেশিরভাগ সচেতন লোকই এগুলোর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাহলে এনসেল্‌মের কথামতো বলতে হয়, যারা ঐসকল দৈত্য-দানো-জ্বীন-পরী-হাসজারু-সোনারপাথর বাটি-কাঁঠালের আমসত্ব ইত্যাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তাদের মধ্যেও ঐসকল কাল্পনিক সত্তার ধারণা রয়েছে? কিন্তু আমরা জানি, আসলে তা নয়। বরং তারা তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমেই সচেতনভাবে এইসকল কাল্পনিক সত্তার বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করেন; কোন ধরণের বিশ্বাসের বা ধারণার বশবর্তী হয়ে নয়।

(৩) মনোবিজ্ঞান (Psychology), নৃবিজ্ঞান (Anthropology), সমাজবিজ্ঞান (Sociology)-এর গবেষণা থেকে আমরা জানি, এই ঈশ্বরের এবং উপাসনা-ধর্মের (Religion) ধারণা মোটেও একদিনে একইসাথে পৃথিবীর সর্বত্র তৈরি হয় নি। বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে বিভিন্নভাবে মানুষের মধ্যে উপসনা-ধর্মভাবনা উদ্ভাবিত হয়েছিল উৎপাদন শক্তি বিকাশের এবং মানুষের জীবনধারণের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। আজকে যে একঈশ্বরবাদ (Monotheism) কথা বলা হয়, সেই একঈশ্বরের অস্তিত্বও খুববেশি প্রাচীনকালের মানুষের মধ্যে ছিল না। যতদূর জানা যায়, মানুষের লিখিত ইতিহাসের বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বছর (বর্ণমালা আবিস্কার করেছে মাত্র ১৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে) এবং এখন থেকে প্রায় সাত থেকে আট হাজার বছর আগে মানুষ তার যাযাবর জীবনের প্রস্তরযুগ পেরিয়ে এসে ধাতুর ব্যবহার (লোহা আবিস্কার করেছে ১৪০০

খ্রিষ্টপূর্বাব্দে) এবং কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলেছে। এই কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ফলে মানুষের জাগতিক পরিবেশে উপাসনা-ধর্মীয় কল্পনার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। আমাদের এই ভারতবর্ষে বহুঈশ্বরবাদ (Polytheism) বৈদিক উপাসনা-ধর্মের (সনাতন হিন্দুউপসনা-ধর্মের পূর্বসূরী) উদ্ভব হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব দেড়হাজার বছর আগে, বৌদ্ধ উপাসনা-ধর্মের (যদিও একে প্রচলিত ধারায় উপাসনা-ধর্ম বলে চিহ্নিত করা যায় না) সুত্রপাত খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় দুই থেকে দেড় হাজার বছর আগে আরবের উত্তরে ইসরায়েল অঞ্চলে একঈশ্বরবাদ (Monotheism) ইহুদি উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। শুরুতে অবশ্য একেশ্বরবাদের চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গাছপালা, পাথর-পাহাড়, ঝর্ণা ইত্যাদির পুজো (Nature Worship) করা হতো। পরবর্তীতে ৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইহুদি উপাসনা-ধর্ম চুড়ান্তরূপ পায় এবং একঈশ্বর ইয়াহুয়া (Yahweh)'র কল্পনা পল্লবিত হয়। খ্রিষ্টধর্মের যীশু (জন্ম : খ্রিষ্টপূর্ব ৬ মৃত্যু : খ্রিষ্টাব্দ ৩০) জন্মের বেশ আগে থেকে প্যালেস্টাইনে যীশু (Jesus) নামে এক দেবতার কল্পনা করা হতো। যদিও খ্রিষ্ট উপসনা-ধর্মের প্রচারক হিসেবে পরিচিত যীশু নামে আদৌ কেউ ছিলেন কিনা, এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে, তবে খ্রিষ্ট উপসনা-ধর্ম বিকাশ লাভ করে খ্রিষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে। হযরত মোহাম্মদ কর্তৃক আরবে একেশ্বরবাদী ইসলাম উপাসনা-ধর্ম বিকশিত হয় আধুনিক কালে, মাত্র সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে।

মানববিবর্তনের ধারায় মনুষ্যপ্রজাতির একস্থর নিয়ান্ডার্থাল (Neanderthal : আড়াই লক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগের) প্রজাতির মধ্যেই সর্বপ্রথম কোনো ধরণের ঈশ্বরের অস্তিত্ব (কিংবা বিশ্বাস) ব্যতিরেকে শুরু হয়েছিল প্রাকধর্মীয়আচরণ (Pre-religous behaviour)। বিজ্ঞানীরা এই প্রাকধর্মীয় অবস্থার সময়কাল সর্বোচ্চ ষাট হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের বেশি পুরনো নয় বলেই মনে করেন। এখন পর্যন্ত নিয়ান্ডার্থাল প্রজাতির আগের স্তর জাভা বা পিথেকানথ্রোপাস (*Pithecanthropus erectus*) বা সিনানথ্রোপাস (*Sinanthropus pekinesis*)-এর মধ্যে কোনোরকম ধর্মাচরণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। বরং বলা যায়, তখন তাদের স্থূল জৈবিক প্রয়োজনেই প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থা ও জীব-জন্তুর সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে। তাছাড়া, তখনকার মানুষেরমতো প্রজাতিসমূহের মস্তিষ্ক বা চিন্তা করার ক্ষমতা আজকের মতো এতোটা উন্নত ছিল না। (একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায় : পিথেকানথ্রোপাস বা জাভা মানুষের (১৫ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ বছর আগের) মস্তিষ্কের আয়তন ছিল বর্তমান আধুনিক মানুষের (Cro-magnon) মস্তিষ্কের আয়তনের দুই-তৃতীয়াংশ; এবং মস্তিষ্কের যে অংশ মানুষের কথা-বলা, চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করে সেই Frontal lobe এবং Temporal lobe, তারও আয়তনের বৃদ্ধি ঘটেনি।) নিতান্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাদের চেতনা ব্যতিব্যস্ত ছিল। প্রাণ ও প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করা, কার্য-কারণ নিয়ে ভাবনা, মৃত্যুর পর কী ঘটে ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ধীরেধীরে হাজার-হাজার বছরের ক্রমবিকাশের পর পৃথিবীর চতুর্থ হিমযুগের সময় বা পঞ্চাশহাজার বছর আগে উদ্ভব ঘটে নিয়ান্ডার্থাল প্রজাতির। এই প্রজাতিই প্রথম কৃত্রিমভাবে আগুন জ্বালানোর কৌশল আবিষ্কার করে। তাদের মস্তিষ্ক আধুনিক মানুষের মতো উন্নত ও জটিল না হলেও, পূর্ববর্তী পিথেকানথ্রোপাস প্রজাতির থেকে বেশ বিকশিত ছিল। ফলে তারা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মিটিয়ে জীবন-মৃত্যুর রহস্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিল বলে মনে হয়। স্বপ্ন দেখার ঘটনাও এদেরকে নানারকম আধোভৌতিক কল্পনায় উৎসাহিত করে থাকতে পারে। চিন্তা ও নানা প্রাকৃতিক রহস্য সমাধানের জন্য এরা আত্মার (Soul) কল্পনা করেছে। ফলে নিয়ান্ডার্থাল প্রজাতিরা মৃতের শরীরকে নষ্ট না করে বা অবহেলায় ফেলে না রেখে কবর

দেয়ার ব্যাপারটি চালু করেছিল এবং মৃত্যুর পর যাতে মৃতব্যক্তির কোনো কষ্ট না হয় সেজন্য তৎকালীন দৈনন্দিন জীবনের নিত্য ব্যবহার্য কিছু জিনিস কবরের সঙ্গে রেখে দেয়ার বিধান শুরু করেছিল। উত্তর ইরাকের শানিদার গুহায় (Shanidar Cave) এই ধরনের এক কবরস্থান আবিস্কৃত হয়েছে যাতে ধর্মীয় ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। কার্বন ডেটিং (C-14) প্রকৃয়ায় এটির বয়স প্রায় আনুমানিক ৬০,০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ বলে জানা গেছে; এবং এটিই এখনো অব্দি আবিষ্কৃত মানুষের ধর্মাচরণের প্রাচীন নিদর্শন। আত্মার আদিম ধারণাই হাজার হাজার বছর ধরে, শতশত বংশ পরম্পরায় পল্লবিত হয়েছে, আলোড়িত করেছে আদিম নিয়ান্ডার্থাল মানুষের মনকে। এখন থেকে প্রায় ৪০,০০০-১৮০০০ হাজার বছর আগে উচ্চতর পুরাপ্রস্তর যুগে (Upper Palaeolithic Period) আধুনিক মানুষের সৃষ্টি। এসময়ই আত্মা, পরমাত্মা, যাদুবিদ্যা (Magic) ইত্যাদি সম্পর্কিত ধারণাবলীও আরো সুসংহত হয়েছে। এসময়ে পাথরের তৈরি অস্ত্র উন্নত হয়েছে, এর ফলে খাদ্যের যোগান আস্তে আস্তে সফল ও নিরাপদ হচ্ছিল। এই ধারাবাহিকতায় প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করা এবং নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠানও উন্নত হয়েছে। ফ্রান্স, ক্রিমিয়া, উজবেকিস্থান ইত্যাদি অঞ্চলে প্রস্তর যুগের বিভিন্ন কবরস্থানের উপর নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, কারো মৃত্যুর পর পরে তারা কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করতো, যা এখনকার শ্রাদ্ধ, কোরাণখানি, প্রার্থনা ইত্যাদির পূর্ববর্তীপ্রথা। ইউরোপে প্রাপ্ত ত্রিশহাজার থেকে দশহাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দ সময়কার প্রাচীন বিভিন্ন গুহার ছবি থেকে দেখা যায় ঐ গুহাগুলি পুজোর জন্য ব্যবহৃত হতো (উত্তর স্পেনের El Jnyo গুহার অভ্যন্তরীণ অলংকরণ থেকে গবেষণা করে দেখা গেছে এটি প্রায় বারহাজার বছরের পুরনো এক পুজোর স্থল বা Shrine ছিল, যা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে প্রাচীন পুজোরস্থল।)। ঐসকল পুজো অর্চনার ক্রিয়া পরিচালনার জন্যে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে (?) সন্তুষ্ট করতে সক্ষম কিংবা চিন্তা করার কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী কেউ কেউ নৃত্য, শরীরে বিভিন্ন চিত্রাঙ্কন করে, মন্ত্রোচ্চারণ ইত্যাদি নানা কৌশলের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করতো। যাদেরকে যাদুকর (Sorcerer) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যারা প্রচার করতো, তাদের ওপর অলৌকিক শক্তি ভর করেছে এবং ভর করা অবস্থায় তারা নানা অসাধারণ কাজ করতে সক্ষম। আজকাল আমরা যাদের পুরোহিত, অবতার, বাবাজি-মাতাজি, মোল্লা, যাজক, পীর-ফকির নামে অভিহিত করে থাকি। এই বিশেষ এক ব্যক্তির উপর অলৌকিক শক্তির ভর হওয়ার ধারণাকে শামানিজম (Shamanism) বলে। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পশুশিকার করা, চারা রোপন করা, মাছ ধরা, বিপদ এড়ানো, ভ্রমণে নিরাপত্তা জন্য সৃজনধর্মী যাদু(White magic) এবং শত্রুর ক্ষতি করার জন্য, রোগ সৃষ্টির জন্য, জীবননাশের জন্য ধ্বংসাত্বক যাদু (Black magic)-র আশ্রয় নিতো। যদিও এগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে মানুষ কখনোই নিসংশয় ছিল না। তবে এই সকল যাদুবিদ্যার প্রতি মানুষের বিশ্বাস থেকে আস্থার ভাব ছিল বেশি। এ থেকে বুঝা যায়, মানুষ তাঁর জীবন কখনোই প্রকৃতির হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চায়নি বরং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য ইচ্ছাপূরণের শক্তি সে নিজ হাতে অর্জন করতে চেয়েছিল, যার জন্য কিছু লৌকিক কৌশল খাটিয়ে এবং কিছু বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তারা সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই বলা যায়, ঐ যাদুবিদ্যা যদিও কোন উপাসনা-ধর্ম নয় তবু যাদুবিদ্যার বেশ বড় প্রভাব উপাসনা-ধর্মের উৎপত্তিতে রয়েছে। তাছাড়া ঐ সময়ের কিছু গুহাগাত্রে (পশ্চিম ইউরোপে ও রাশিয়ায়) প্রাপ্ত বেশকিছু ছবিতে উলঙ্গ, বৃহৎস্তনযুক্ত অতিমাত্রায় স্ফীত-উদরসহ নারীর ছবি বিশ্লেষণ করে গবেষকগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এগুলো মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আবাসস্থলের দেবী ও যৌনতা-উর্বতার (Fertility Cult) দ্যোতক। নারী ও ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা লক্ষ্য করে নারী ও ভূমিকে (পৃথিবীকে) অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবীরূপে কল্পনা করা হতো এবং তাদের পুজো করা হতো। ধারণা করা হয়ে থাকে, উর্বরাশক্তির প্রতীক

হিসেবে এবং অধিকতর ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত প্রথা চালু হয়েছিল। ব্যবিলনে দেবীদের মধ্যে Ishtar বা পৃথিবীদেবীই ছিল শ্রেষ্ঠতম। সমস্ত পশ্চিম এশিয়া জুড়েই বিভিন্ন নামে মহামাতৃকার (Great mother) বন্দনা করা হতো একসময়। গ্রীকরা উর্বরতার প্রতীক হিসেবে Artemis নামে দেবীর বন্দনা করতো। অবশ্য প্রাচীন মিশরে প্রথমে আকাশকে নারী রূপে এবং পৃথিবীকে পুরুষ রূপে কল্পনা করা হয়েছিল। মানুষ তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তৈরি করেছিল। পরবর্তীতে উৎপাদন শক্তি এবং মানুষের জীবনধারণের প্রকৃতি পরিবর্তনের ফলেই ঐ সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রূপ নেয়।

নব্যপ্রস্তর যুগে (পাঁচ হাজার বছর পূর্বে) কোনো কোনো স্থানে মৃতদেহ দাহ করার প্রথা প্রচলিত হয়েছিল বলে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুরাপ্রস্তর যুগের শেষের দিকে (পুরাপ্রস্তরীয় কালকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে; যেমন (১) Aurignancian (২) Solutrean (৩) Magdalenian (৪) Azilian) অ্যাজিলিয়ান (Azilian) সময়ে আঁকা গুহাচিত্রে বিভিন্ন জ্যমিতিক চিত্র, পাথরের একদিকের গায়ে সমান্তরাল রহস্যময় লাল রঙ্গিনরেখা, ডিম্বাকার চিহ্ন এবং অক্ষর জাতিয় চিহ্নাদির নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসকল ছবি বিশ্লেষণ করে তৎকালিন মানুষের টোটেম (Totem) ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অনুমান করা হয়। এই টোটেমচিন্তা (Totemism) যদিও কোনো উপাসনা-ধর্ম নয়, তবুও এর সাথে বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন উপাসনা-ধর্মীয় উপাদান মিশে আছে বা একেও প্রাক ধর্মীয় অবস্থা বলা হয়ে থাকে। টোটেমিজম হচ্ছে প্রাচীনকালের প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষের অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসের একটি রূপ। টোটেমিজমের কিছু চিহ্ন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জাতীয় বা আদিবাসী উপাসনা-ধর্মে পাওয়া গেলেও অস্ট্রেলিয়া, মধ্য আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার আদি অধিবাসীদের মধ্যে এটি এখনও প্রবলভাবে বিদ্যমান। সকল অঞ্চলেই টোটেমচিন্তার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ চোখে পড়ে। যথা :- (১) টোটেম-কে আত্মীয়, রক্ষাকর্তা, সাহায্যকারী বন্ধু বা বংশের আদিপুরুষ হিসেবে কল্পনা করা হতো। (২) টোটেম-কে বিশেষ নাম বা প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত করা হতো। (৩) টোটেমের সঙ্গে নিজেদের আংশিক একাত্মতা বা প্রতীকী আত্মীকরণের দিক কল্পনা করা হয়েছে। (৪) টোটেম-কে হত্যা করা, খাওয়া, এমন কি স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। (৫) টোটেম-কে কেন্দ্র করে নানা অনুষ্ঠান ও আচারবিধির সৃষ্টি। সনাতন হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গোত্রপ্রথা, মনসাদেবীরূপে সর্প পুজো, তুলসীগাছের পুজো, বানর-হনুমান, গরুকে দেবতার অংশীদার হিসেবে পুজো ইত্যাদি এই টোটেমীয় ধারণার ফল। প্রাচীন গ্রীক উপাসনা-ধর্মেও টোটেম বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন : Artemis এর উৎস স্ত্রীভালুক বা হরিণী, Hermes হচ্ছে মেষ, Hera হচ্ছে গাভী বা ছাগী এবং গ্রীক সভ্যতায় কতকগুলি জন্তু-কে খাদ্য হিসেবে গ্রহণের ব্যাপারে স্থানীয় নিষেধাজ্ঞা বা Taboo-ও প্রচলিত ছিল। ‘‘টোটেম’’ বিশ্বাসের মূল প্রকৃতি হলো মানুষের একটা গোষ্ঠী, উপজাতি, বংশ বা পরিবারের সঙ্গে কোন জন্তু বা উদ্ভিদজগতের এবং কোন কোন সময় কোন জড় পদার্থ যেমন প্রস্তর খন্ডের সঙ্গে একটা অতিপ্রাকৃতিক সম্পর্কের অস্তিত্বে বিশ্বাস। আরেকটু স্পষ্ট করে বলা যায়, টোটেম হচ্ছে একটা উদ্ভিদ বা জন্তু, যাকে পূর্বপুরুষ হিসাবে ধরে নিয়ে বিশ্বাস করা হয় যে সমষ্টিগতভাবে কোন বংশ বা পরিবারের বা ভিন্নভিন্নভাবে তাদের সদস্যদের জীবন ও ভালো-মন্দ সবকিছুই সবরকম ও অতিপ্রাকৃতভাবে নির্ভরশীল ঐ উদ্ভিদ বা জন্তু বা জড়পদার্থরূপী পূর্বপুরুষের উপর; এবং ঐ টোটেমকে প্রভাবান্বিত করে ঐ পরিবার বা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে প্রাণী, উদ্ভিদ, ও প্রস্তরের প্রচুর্য সৃষ্টি করা সম্ভব। টোটেম বিশ্বাসের আরোও তাৎপর্য হলো, মানুষ বিশ্বাস করতো যে পরিবারের বা বংশে কোন নতুন সন্তানের জন্মগ্রহণের অর্থ হলো ঐ নবজাতকের

মধ্য দিয়ে ঐ উদ্ভিদ বা জন্তুরূপী অথবা জড়পদার্থরূপী টোটেমই মূর্ত হয়ে থাকে। আদিম কাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির কয়েকটি সম্পদের অপরিহার্যতাকে অনুভব করেছিল। যেমন, বেঁচে থাকার জন্য পানি এবং সূর্য অপরিহার্য। ফলে দেখা যায়, উপাসনা-ধর্মচিন্তা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিও সম্পৃক্ত হয় উপসনা-ধর্মীয় ঐশ্বরিক-আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকন্ডের সঙ্গে। পৃথিবীর প্রায় সব প্রান্তের মানুষই সমুদ্র এবং নদ-নদীর অধিষ্ঠাতা হিসেবে দেব-দেবীর কল্পনা করেছে, এই নদ-নদীর পানি দিয়ে শরীর পরিশুদ্ধ করে অলৌকিক ঐশ্বরিক শক্তির কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সনাতন হিন্দুউপাসনা-ধর্মালম্বীদের কাছে গঙ্গা নদী একটি পবিত্র স্থান এবং তাদের প্রচলিতবিশ্বাস এই নদীতে গোসল করিলে পাপ মোচন হয়। একইভাবে সূর্যদেবতাও পৃথিবীর সকল আদিম ও প্রাচীন সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মিশরে অনেক আগে থেকেই রা (Ra), গ্রীসে এপলো (Appollo), ভারতবর্ষের বৈদিক উপাসনা-ধর্মে ইন্দ্র নামে সূর্যের উপাসনা করা হতো।

এখন থেকে প্রায় দশহাজার বছর আগে পুরাপ্রস্তর যুগের শেষের দিকেই মানুষের মধ্যে সর্বপ্রাণবাদ (Animism), জড়াত্মবাদ (Animatism) -এর ধারণা সংহত হয়। এমিল ডুরখেইমের (E. Durkheim) মতে, "*টোটেমবাদের সাথে সর্বপ্রাণবাদের মিল রয়েছে। এবং টোটেমের ধারণা থেকে পরবর্তীতে বিকশিত হয়ে উপসনাধর্মের উৎপত্তি লাভ করে।*" প্রকৃতির সবকিছুকে জীবন্ত বা সপ্রাণ মনে করাকে সর্বপ্রাণ বলা হয়ে থাকে। মানুষের নিজের চেতনাকে গোটা প্রকৃতির ওপর আরোপ করার মধ্যেই সর্বপ্রাণবাদের বৈশিষ্ট্য নিহিত। ইংরেজ নৃতাত্ত্বিক স্যার এডওয়ার্ড বার্নেট টাইলর (Edward Burnet Tylor)"**Primitive Culture**" গ্রন্থে বলেন, "*এই সর্বপ্রাণবাদই উপাসনা-ধর্মের সবচেয়ে আদিম রূপ এবং আদিম মানুষ জীবন ও মৃত্যুর ধারণা খুঁজতে গিয়েই আত্মার ধারণা তৈরি করে। পরে সর্বত্র প্রাণের ধারণা ছড়িয়ে দেয়।*" আদিম মানুষের কাছে ধারণা ছিল যা কিছু ক্রিয়াশীল তাই জীবন্ত। একটি প্রস্তর খন্ডকে দূরে নিক্ষেপ করলে তাও ক্রিয়াশীল হয়। অতএব জীবন্ত হওয়ার দরুন যে কোন পদার্থ- জড় অথবা প্রাণী- সকলেরই একটা আত্মা বিদ্যমান। আর এই আত্মা মানুষ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে। কাজেই সমস্ত জগতটাই হলো আত্মাবিশিষ্ট পদার্থের সমাবেশ। সর্বপ্রাণবাদের ধারণা সর্বত্র নরত্ব আরোপ করে এবং জন্মান্তরের ধারণাও সংযুক্ত। সনাতন হিন্দু ধর্মে শিব লিঙ্গের পুজো, সূর্যের পুজো অনেকটা সর্বপ্রাণবাদের ধারণা। বিভিন্ন জাতীয় উপাসনা-ধর্মে এবং আদিবাসী উপাসনা-ধর্মে এখনও সর্বপ্রাণবাদের প্রচলন রয়ে গেছে। এবং জড়াত্মবাদ (Animatism) হচ্ছে অলৌকিক প্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস কিন্তু এই বিশ্বাস কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তায় নয়। যেমন আদিম মানুষ বিশ্বাস করতো বন্যা, ঝড়, বৃষ্টি, রোদ ইত্যাদি সম্পর্কে কোন লৌকিক ব্যাখ্যা না তৈরি করতে পারার দরুন এগুলিকে তারা ভয় করতো, পুজো করতো। এই জড়াত্মবাদ থেকে আস্তে আস্তে ফেটিশবাদের (Fetishism) সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ আবার জড়াত্মবাদ থেকেই সর্বপ্রাণবাদের সৃষ্টি বলে মনে করে থাকেন। ফেটিশবাদ হচ্ছে, "*ইচ্ছাপূরণের জন্য জড়পদার্থে বাঞ্ছিত শক্তির আশ্রয়। অচেতন পদার্থের প্রতি এ হল এক বিশেষ ধরণের অনুরক্তি।*" আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে এখনও কোন কোন বিশেষ বস্তুর ভিতর ভৌতিক শক্তির আশ্রয় সম্পর্কে বিশ্বাস রয়েছে। জড়বস্তু সেই শক্তি ধারণ করে উপাস্য হয়ে ওঠে। তবে ফেটিশবাদে উপাসনা-ধর্মীয় দেবতার মতো কোন স্থায়িত্ব নেই। যখন কোন ফেটিশ দ্বারা কার্য উদ্ধার হয় না, তখন আর তাকে পুজো করা হয় না। ব্যর্থ ফেটিশকে ত্যাগ করা হয়; পরবর্তীতে নতুন একটি ফেটিশ খোঁজা হয়। যদিও ফেটিশবাদ এখন আর সর্বত্র প্রচলিত নয়, তবে পুর্বপুরুষের পুজো (Ancestor Worship) এখনও অনেক জায়গায়

প্রচলিত রয়েছে। উপাসনা-ধর্মের উদ্ভবের পেছনে এই পূর্বপুরুষের পুজোর বেশ বড় প্রভাব রয়েছে। মানুষের পূর্বপ্রজাতি নিয়ান্ডার্থালদের মধ্যেও পূর্বপুরুষকে স্মরণ করার খানিকটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষে পূর্বপুরুষের পুজো বেশ প্রচলিত ধারণা। মৃত্যুর পর পুর্বপুরুষকে স্মরণ করে নানা রকম প্রথা, অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়ে থাকে; যেমন, হিন্দু উপাসনা-ধর্মালম্বীরা শ্রাদ্ধ, তর্পন, মুসলামানেরা মিলাদ, কোরাণখানি ইত্যাদি পালন করে থাকেন। মূলত এসকল উপাসনা-ধর্মালম্বীদের কাছে মৃত্যুর পর আত্মিক অস্তিত্বের একটি বিশ্বাসের জায়গা আছে। পৃথিবী এবং পরলোকের সীমান্তকে অতিক্রম করার প্রবণতা এখানে দৃশ্যমান।

অনেক নৃতাত্ত্বিকের ধারণা (E. B. Tylor, victor Brown, E. Durkheim etc) যাদু, টোটেমবাদ, সর্বপ্রাণবাদ, জড়াত্মবাদ, ফেটিশবাদ, পূর্বপুরুষের পুজো ইত্যাদি ধারণার ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়েই মানবসমাজে বহুঈশ্বরবাদের সৃষ্টি হয়। এবং বহুঈশ্বরবাদ এই সকল ধারণার সমষ্টি। পরবর্তীতে বহু ঈশ্বরবাদ থেকে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়েই একঈশ্বরবাদের ধারণা তৈরি হয়। এই একঈশ্বরবাদের ধারণা আমাদের মানবসমাজে খ্রিষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছরের বেশি প্রাচীন নয়। একঈশ্বরবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে Victor Brown বলেছেন ''*রাজতান্ত্রিক সমাজে অসম ক্ষমতা বন্টনের চূড়ান্ত শক্তিধর শাষক থাকে। তার সাথে শক্তিশালী ঈশ্বরের ধারণা যুক্ত হয় বলে তা একেশ্বরবাদের জন্ম নেয়।*'' অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই, মানুষ তার যাযাবর জীবন ছেড়ে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করতো, তখন সে বহুঈশ্বরের পুজো করতো। কিন্তু কালক্রমে মানুষ রাষ্ট্রগঠন (আনুমানিক ৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে) করার পর রাষ্ট্রের শাসকের সাথে ঈশ্বরের শক্তির মিল রেখে একঈশ্বরের পুজো শুরু করলো। এই একেশ্বরের পুজো করা প্রথমে ইহুদি ধর্মেই প্রথম শুরু হয়। পরবর্তীতে তা বেশ কয়েকটি উপাসনা-ধর্মে স্থানান্তরিত হয়। তবে এখনও সর্বত্র একেশ্বরবাদের চর্চা শুরু হয় নি। এখনও অনেক জায়গায় বহুদেববাদের প্রচলন রয়ে গেছে। অর্থাৎ লক্ষ্য করা যায়, মানব সভ্যতার উত্থান-পতনের মতোই উপাসনাধর্মের বিকাশ ঘটেছে। আজকের যে একেশ্বরবাদ, ভবিষ্যতে এই রকম নাও থাকতে পারে। পরিবর্তন- বিবর্তন ঘটবে। এই বিবর্তনই সভ্যতার ধর্ম। বর্তমানে একেশ্বরবাদে ঈশ্বরের তিনটি গুণাবলী রয়েছে। যথা - (১) সর্বশক্তিমানতা বা Omnipotence (২) সর্ববিরাজমানতা বা Omnipresence (৩) সর্বজ্ঞতা বা Omnisceience। এই সকল গুণাবলীও মানুষ তার নিজের কোন না কোন সীমাবদ্ধতার কারণে কল্পিত ঈশ্বরের ওপর আরোপ করেছে। উপরের এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে দেখা যায়, (***i***) উপাসনা-ধর্মীয় তথা ঐশ্বরিক চিন্তা আদিম মানুষকে কেউ দেয়নি, আদিম মানুষই তার ক্রমবিকাশমান মস্তিষ্কের কার্যকারিতার বলে এই প্রতিকূল পরিবেশে আশ্রয় লাভের জন্য, নিজের অসহায়ত্বকে ঢাকার জন্য, দুঃখ-কষ্ট চেপে রাখার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি না পেয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে ঈশ্বরসম্পর্কিত চিন্তা সৃষ্টি করেছে। (***ii***) মানুষ তার নিজের বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর জন্যই (অন্তত সে যাকে মনে করেছে 'প্রয়োজন মেটানো') আত্মা, মৃত্যুপর্বর্তী প্রাণ ইত্যাদি ধারণার উদ্ভাবন করেছে তথা উপাসনা-ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছে। (***iii***) মানুষ ঈশ্বরের সন্তান নয়, ঈশ্বরই মানুষের কল্পনার সন্তান।

(৪) রেনে দেকার্ত (Rene Descartes) ঈশ্বরের ধারণা উদ্ভবের পেছনে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমাদের সমস্ত ধারণাই আসে অভিজ্ঞতা থেকে এবং এই ঈশ্বরের ধারণাও এর ব্যতিক্রম নয়। যেহেতু এই জগতে কোনো বস্তুই অসীম বা পূর্ণ নয়, সেহেতু এই গুণসম্পন্ন ঈশ্বরের ধারণাও কোন বাস্তব বস্তুর ধারণা নয়। মানুষ তার

মস্তিষ্কের মাধ্যমে চিন্তা করে। এই চিন্তার দুটি পারস্পরিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে ; একটি হচ্ছে সৃজনশীলতা (Creativity) এবং অন্যটি অনুকরণশীলতা (Imitativeness)। সৃজনশীলতার মাধ্যমে মানুষ নতুন কিছু নিয়ে চিন্তা করতে পারে, নিত্যনতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে পারে। মানুষ এই গুণাবলীর কারণেই সমাজ জীবনে, ব্যক্তিজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম, উন্নতি ঘটাতে সক্ষম। আর অনুকরণশীলতার মাধ্যমে বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতালব্ধ কোনো বস্তুর সাথে অন্য বস্তুর তুলনা করে থাকে। প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করার ফলেই তার মধ্যে নতুন এক বস্তু সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা যাক, ঈশ্বরের যেসকল গুণাবলী উপাসনা-ধর্মীয় দর্শনে প্রচলিত, তার প্রত্যেকটি গুণাবলীর কোনো না কোনো রূপ সে বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ করে থাকে। যেমন : ঈশ্বরের **প্রথম গুণাবলী** হচ্ছে তিনি সর্বশক্তিমান (অর্থাৎ বলা যায় শক্তিহীন ঈশ্বর, ভক্তি উদ্রেকে অক্ষম!)। আমরা জানি, মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। মানুষের থেকে শারীরিক দিক থেকে অনেক শক্তিশালী জীব এ পৃথিবীতে বিদ্যমান। তাই সে নিজের শক্তিহীনতা এবং অন্য জীবের শক্তির সাথে তুলনা করে সর্বশক্তিমান গুণটি কল্পিত ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করেছে। ঈশ্বরের **দ্বিতীয় গুণাবলী** হচ্ছে তিনি সর্ববিরাজমান। অবশ্য একেশ্বরবাদীরা এই সর্বব্যাপী গুণাবলীকে সর্বশ্বরবাদীর (Panthesim) অর্থে গ্রহণ করেন না। ঠিক কি অর্থে তিনি সর্বব্যাপী? তিনিই কি সবকিছু এবং সবকিছুই কি ঈশ্বর? নাকি তিনি শুধু জগতের সর্বত্র দৈহিক অবস্থান করেন? তাহলে তাঁর নিজস্ব দৈহিক সত্তা রয়েছে! কিন্তু তাঁর দৈহিক সত্তা না থাকলেও স্থানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যই তা সম্ভবও নয়। আবার ঈশ্বর যেহেতু স্থান-কাল সৃষ্টির হেতু তাই তিনি সব বস্তুর অধীন হতে পারেন না, উর্ধ্বে হতে হয়। যাই হোক, আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা আদিবাসী কিংবা জাতীয় উপাসনা-ধর্মের উদ্ভবের পর এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের স্থানগত সংকীর্ণতা। ঐ সকল উপাসনা-ধর্মগুলো কেবল সেই সামাজিক গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাদের দেবতা-উপদেবতারাও কেবল নির্দিষ্টস্থানের দেবতা। পরবর্তীতে মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের ফলে বিভিন্ন উপাসনা-ধর্মেরও বিস্তৃতি ঘটে। নির্দিষ্ট এক স্থানের উপাসনা-ধর্মালম্বীরা অন্য স্থানের উপাসনা-ধর্মালম্বীদের সাথে পরিচয়ের পর মানুষ বারংবার উপলব্ধি করে, '' ***আমার ঈশ্বরই সত্য। আমার ঈশ্বরই, সকলের ঈশ্বর। আমার ঈশ্বরই সকল স্থানে বিদ্যমান। তিনি সর্বভূতে বিরাজমান।***'' ফলে স্থানিক, কালিক, গোষ্ঠীক পরিক্রমায় আবদ্ধ মানুষ এই সর্ববিরাজমান গুণটি ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করে। ঈশ্বরের **তৃতীয় গুণাবলী** হচ্ছে তিনি সর্বজ্ঞ। আমরা জানি, মানুষের অভিজ্ঞতা সবসময়েই সীমিত। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি সবসময় আংশিক ও খন্ডিতরূপে প্রকাশ পায়। এবং মাঝে মাঝে ভুলরূপেও প্রকাশ পায়। তার অজ্ঞতা ও জ্ঞান সুস্পষ্ট সীমারেখা দিয়ে ঘেরা। ফলে নিজের এই অভিজ্ঞতালব্ধ অজ্ঞতার বেদনা থেকে সচেতনভাবে এবং অচেতনভাবে মুক্তি পাবার দুর্নিবার তাগিদেই, মানুষ কল্পিত ঈশ্বরের প্রতি সর্বজ্ঞ বিশেষণটি আরোপ করেছে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের উপর আরোপ করা গুণাবলীগুলির প্রত্যেকটিই কোন না কোনভাবে মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ। শুধু ঈশ্বরের ওপর আরোপিত গুণাবলীই নয় অন্যান্য যেসকল কাল্পনিক সত্তা রয়েছে, তাদের কোন না কোন বৈশিষ্ট্যই মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ। যেমন কাঁঠালের আমসত্ব। কাঁঠাল আমরা সবাই ব্যবহারিক জীবনে প্রায়ই দেখে থাকি (বাংলাদেশের জাতীয় ফলটি আবার অনেকের প্রিয় ফল) এবং আমসত্বও। ফলে এই দুইটি দৃশ্যমান বস্তুকে একসাথে মিলিয়ে একটি কাল্পনিক সত্তা আমরা তৈরি করেছি। আবার বলা যায় পক্ষিরাজঘোড়ার কথা। পাখি আকাশে ওড়ে এবং ঘোড়া খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় এগুলি নানা সময়ে নানাভাবে দেখে থাকি। ফলে মানুষের চিন্তার সৃজনশীল এবং অনুকরণশীল বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই এ দুই জীবকে একত্রে মিলিয়ে একটি কাল্পনিক সত্তা

আমাদের পূর্বপুরুষরা তৈরি করেছেন; যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

(৫) ইংল্যান্ডের আর্থনীতিক, দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪) বলেন, ‘‘ঈশ্বরের ধারণা আসলে একটি অস্তিত্বহীন সত্তার ধারণা এবং এটি আমরা গঠন করি কল্পনার সাহায্যে। জ্ঞান, কল্যাণ, শক্তি ইত্যাদি গুণগুলোর উপস্থিতির অভিজ্ঞতার সাহায্যে এরকম কল্পিত সত্তার অস্তিত্বধরে নিই, যার মধ্যে আমরা এই গুণগুলো সীমাহীনভাবে বিদ্যমান।’’ তিনি আরো বলেন, সসীম এবং অপূর্ণ বস্তুর ধারণা কেবল সদর্থক ও বাস্তব আর অসীম ও পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ধারণা নএ-র্থক ও অবাস্তব। তবে এ বক্তব্যের দ্বিমত পোষণ করেন রেনে দেকার্ত। তিনি বলেন, ‘‘অসীম ও পূর্ণের ধারণা নএ-র্থক নয়; কারণ অসীম ও ত্রুটিহীনের ধারণাকে সসীম ও ত্রুটিপূর্ণের ধারণার পূর্ববর্তী বলে না মানলে, সসীমকে সসীম বলে চিনতে পারা যাবে না।’’ দেকার্তের এই বক্তব্যকে ভিন্নআঙ্গিকে উপস্থাপন করেন জার্মান দার্শনিক লাইবনিজ (***Leibnitz***)। তিনি বলেন, ‘‘ প্রথমেই ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব আছে তা ধরে নিয়ে, যুক্তি দিয়ে তাকে প্রমাণ করতে গেলে, তা হয়ে পড়ে যুক্তিবিরোধী ভ্রমাত্মক চিন্তা, যেহেতু ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্বই এখানে প্রমাণিতব্য বিষয়। একারণে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এটা প্রমাণ করা দরকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব ‘‘সম্ভব’’ যেহেতু তা ‘‘অসম্ভব’’ নয়। কিন্তু আমাদের কাছে অসম্ভব কি? অসম্ভব হলো তাই, যা স্ববিরোধী। অর্থাৎ কোনো বিষয়ের চিন্তায় যদি স্ববিরোধিতা না থাকে তবে সেই বিষয়টিকে সম্ভব বলা যায়। তাই দেখা যায় ঈশ্বর আছেন অর্থাৎ অস্তিত্বশীল মনে করলে চিন্তায় স্ববিরোধিতা দেখা যায় না, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই সম্ভব।’’ এ প্রসঙ্গেও ভিন্নমত পোষণ করেছেন ইমান্যুয়েল কান্ট। তিনি বলেন, ‘‘ **যদি স্ববিরোধীতাহীন ধারণা থেকেই কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রমান করা সম্ভব, তবে আমার পকেটে একশো টাকা আছে, একথা চিন্তা করলেই অমনি পকেটে একশো টাকা এসে যেতো। কিন্ত বাস্তবে তা কখনো হয় না। কারণ, ধারণা ও অস্তিত্ব দুটি ভিন্ন জিনিস। আমরা চিন্তা বা ধারণার সাহায্যে, কোনো বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি না।**’’ যদিও কান্টের এই বক্তব্যকে গ্রহণ করেননি জার্মান ভাববাদী দার্শনিক **জর্জ উইলহেলম ফ্রেইডরিক হেগেল** (Georg Wilhelm Friedrich Hegel : ১৭৭০-১৮৩১)। তাঁর মতে, ‘‘কান্টের এই সমালোচনা টেবিল, চেয়ার, ইট-কাঠ প্রভৃতি সসীম বস্তুর ক্ষেত্রে প্রজোয্য, যেহেতু এদের ক্ষেত্রে চিন্তার দ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কিছুই সূচিত হয় না। কিন্তু পরম সত্তার ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভর ও অন্যনিরপেক্ষ। তাঁর ক্ষেত্রে অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের চিন্তা, একই কথা।’’ হেগেলের এই ধরণের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ঈশ্বরের মতো এক পরমসত্তার এক সুস্পষ্ট মানন্ড ঈশ্বরবাদীদেরকেই দেখাতে হবে। নয়তো এটি স্রেফ কল্পনার ব্যাপার হয়ে যায়। তাছাড়া হেগেলের স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভর ও অন্যনিরপেক্ষ ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুপপত্তিগুলো আগেই (বিশ্বতাত্ত্বিক, উদ্দেশ্যবাদীযুক্তিসমূহে) খন্ডন করা হয়েছে। তাই বলা যায়, **ঈশ্বরবাদীরা কি নিশ্চিত জানেন ঈশ্বর আছেন, নাকি নিছকই বিশ্বাস করেন?** নিশ্চিত করে জানলে, সেই জানার কি কি উৎস রয়েছে, তার সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখাতে হবে।

(৪) নৈতিক প্রমাণ (Moral Argument) :

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত নৈতিক প্রমাণের ভিত্তি হচ্ছে মানুষের নৈতিক অভিজ্ঞতার তথ্যাবলী। নৈতিক প্রমাণের মূল বক্তব্য হচ্ছে, মানুষের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কারো মনগড়া কিছু নয়, বরং সম্পূর্ণ বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ। মানুষের মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা

মানবপ্রকৃতির আবশ্যিক গুণ বিশেষ এবং এ জগতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থাৎ বলা যায় আমাদের এ জগৎ একটি নৈতিক শৃঙ্খলা স্বরূপ। মানুষের সঙ্গে এ জগতের সম্পর্ক শুধু জ্ঞানের নয়, কর্মের, নৈতিক মূল্যবোধের সম্পর্ক। অর্থাৎ কর্ম, নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের মানব সত্তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জ্ঞান, কর্মকে ব্যাখ্যা করা গেলেও নৈতিক মূল্যবোধকে ব্যাখ্যা ও বোধগম্য করা যায় না। আমরা গতি, শক্তি, মধ্যাকর্ষণ বল প্রভৃতিকে প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যাখ্যা করতে পারলেও ন্যায়-সৌন্দর্য- কল্যাণ-মূল্যবোধকে একই নিয়মে ব্যাখ্যা করতে পারি না। কিন্তু তারপরও এগুলো যতই বিমূর্ত হোক না কেন এসব ধারণা (মূল্যবোধসংক্রান্ত) বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তব। এর পর্যায় প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনার পর্যায়ের বহু ঊর্ধ্বে। এ উচ্চতর পর্যায়ের মূল্যবোধের নিশ্চয়ই এমন এক চূড়ান্ত উৎস রয়েছে, যা আমাদের আচরণকে করে তাৎপর্যপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমন্ডিত।

(Immanuel Kant : 1724-1804)

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে ধর্মীয় দর্শনে নৈতিক প্রমাণের মূল প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন জার্মান দার্শনিক ইমান্যুয়েল কান্ট (**Immanuel Kant**)। তিনি মনে করেন, ‘‘ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোনো যুক্তিশাস্ত্রীয় অনুমানের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না ঠিকই ; কিন্তু তাই বলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে ভিত্তিহীন কোনো ব্যাপার নয়, তা অন্য আর একভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে।’’ তিনি বলেন, ‘‘বুদ্ধি আমাদের যে ধারণা দেয়, সে ধারণার সাহায্যে আমরা প্রকৃত বস্তুকে জানতে পারি না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আমরা জানতে না পারলেও পরমসত্তা বলে একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে। আমরা মানব প্রজাতিকে নৈতিক সচেতনতাসম্পন্ন ও নৈতিকদায়িত্ববোধসম্পন্ন জীব বলে মনে করি। এ নৈতিক জীবনের ভিত্তি হলো : ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদ ও অন্যায়ের তুলনায় ন্যায়ের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস। অথচ, এই বিশ্বাস আমাদের বাস্তব জগতের ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়। কারণ এরকম হলে মানুষ খুব বেশি দিন তার নীতিনৈতিকতা, মূল্যবোধে আস্থা রাখতে পারতো কিনা সন্দেহ, যেহেতু আমরা বাস্তব জীবনে প্রায়শই দেখতে পাই, যারা নিরীহ সৎ তারা দুঃখকষ্ট ভোগ করছে; আর যারা অন্যায়কারী-অসৎ তারা দিনদিন উন্নতি করে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা লক্ষ্য করি, পুন্যবানেরা সুখী নয়, আর যারা সুখী তারা পুন্যবান নয়। অথচ আমাদের নৈতিক স্বভাব সবসময় দাবি করে সদ্‌গুণ (Virtue) ও সুখ (Happiness), পুরস্কার ও উপযুক্ততা, এদুয়ের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক থাকবেই। পরন্তু প্রতিনিয়ত উল্টো অভিজ্ঞতা লাভের পরও কেমন করে তাহলে আমরা নৈতিক আদর্শের বিশ্বাসটিকে বাঁচিয়ে রাখি?’’

কান্ট এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে, আমরা তা করি আসলে কতগুলো অবশ্যস্বীকার্য পূর্বশর্তের মাধ্যমে। এগুলো হলো :

১। **ইচ্ছার স্বাধীনতা**

২। **আত্মার অমরত্ব**

৩। **ঈশ্বরের অস্তিত্ব**

বিষয়গুলো একটু ব্যাখ্যা করা যাক :-

১। **ইচ্ছার স্বাধীনতা** : ইচ্ছার স্বাধীনতা বলতে বোঝায়, মানুষ কী স্বাধীনভাবে নিজে কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে? পারলে কতটুকু? নাকি কোনো ঘটনা দ্বারা বাধ্য হয়ে ইচ্ছা গ্রহণ করে থাকে? কান্ট বলেন : মানষের ইচ্ছার স্বাধীনতা অবশ্যই আছে, এটা কোনো মনগড়া কোনো বিশ্বাস নয়। কিন্তু একে বিনা প্রমাণে মেনে না নিলে এবং পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ না করলে কোনো আচরণেরই নৈতিক বিচার সম্ভব নয়। কারণ, কেবল স্বেচ্ছাকৃত কাজকেই নৈতিক দিক থেকে ভালো-মন্দ বিচার করা চলে। অতএব, যদি নৈতিক জীবনের সত্যতা স্বীকার করতে হয়, তবে আমাদের অবশ্যস্বীকার্য পূর্বশর্ত হিসেবে মেনে নিতে হবে, আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে।

২। **আত্মার অমরত্ব** : আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ-এর লড়াই বা দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করে থাকি। এবং প্রতিনিয়তই এ লড়াইয়ে ন্যায়ের সাথে অন্যায়ের, ভালোর সাথে মন্দের, শুভের সাথে অশুভের জয়ী হতে দেখি। কিন্তু তবু আমরা মনে করি, ন্যায়ের- ভালোর- শুভের জয় অবশ্যম্ভাবী; কারণ এই বিশ্বাস আমাদের চালনা করে যে, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের সংগ্রামের চূড়ান্ত নিস্পত্তি বর্তমান জীবনের ফলাফল দেখে নির্ণয় করা যাবে না। এ সংগ্রাম এক জীবনের নয়, মানুষের মৃত্যুর পর এ সংগ্রাম একটু একটু করে এগিয়ে যাবে চরম পরিণতির দিকে, শেষ ধাপে অবশ্যই অন্যায়ের সাথে ন্যায়ের লড়াইয়ে ন্যায় জয়লাভ করবে। আর এ জন্য প্রয়োজন আমাদের অব্যাহত অস্তিত্ব বা মরণোত্তর জীবন। অতএব, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস নৈতিক জীবনের দ্বিতীয় অবশ্যস্বীকার্য পূর্বশর্ত।

৩। **ঈশ্বরের অস্তিত্ব** : ইমান্যুয়েল কান্ট মনে করেন, আমাদের জীবনের নৈতিক আদর্শ হচ্ছে অনেকটা ‘‘**কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্যের আদর্শ**’’র মতো। তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : ‘‘এটি একটি নিঃশর্ত আদর্শ। অর্থাৎ কর্তব্য করার সময় যদি কোন আবেগ-অনুভূতি, লাভ-ক্ষতি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বশবর্তী হয়ে করা হয়, তবে আর তাকে ভালো বলা যায় না এবং মানুষ তখন কর্তব্যচ্যুত হয়। সুতরাং ফলাফলের চিন্তা না করে কর্তব্যটি করতে হবে শুধু নৈতিক আদর্শটির প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে। তবেই মানুষ কেবল তার জীবনে পরম কল্যাণকে (Supreme Good) পেতে সক্ষম হবে।’’ কিন্তু মানুষের যেহেতুভালো কাজের ফলস্বরূপ সুখ এবং খারাপ কাজের ফলস্বরূপ পাওয়া দুঃখের সমন্বয় সাধন করার

অধিকার নেই কিংবা মানুষ করতে পারে না; তবুও মানুষের এই নিঃস্বার্থ আদর্শের একটা অন্তর্নিহিত দাবি রয়েছে যে মানুষ যেন পূন্যের জন্য সুখ ও পাপের জন্য দুঃখ ভোগ করে। তবে যেহেতু মানুষকে সুখ ও দুঃখের প্রতি সমান উদাসীন হয়ে কর্তব্যজ্ঞানেই কর্তব্য করতে বলা হয়েছে , তাই এই সদ্‌গুণ ও সুখের যথার্থ অধিকারী এমন এক বিধাতাপুরুষ রয়েছেন, যিনি একাধারে প্রাকৃতিক জগতর স্রষ্টা এবং নৈতিক জগতের শাসক। একমাত্র ঈশ্বরই প্রাকৃতিক ও নৈতিক জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে ও শুভ আচরণ ও পরম কল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। সুতরাং নৈতিক বিধাতা হিসেবে ঈশ্বর অবশ্যই আছেন।

কান্টের মতে, এই সকল দাবি উপেক্ষিত হলে নৈতিক জীবন বলে আর কিছু থাকবে না; প্রহসনে পরিণত হবে। কাজেই অসীম, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরকে মেনে না নিলে নৈতিক আদর্শটিকে রক্ষা করা অসম্ভব।

উপাসনা-ধর্মীয় দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত দার্শনিক যুক্তিসমূহের মধ্যে ইমান্যুয়েল কান্টের এই নৈতিক প্রমাণটি (Moral Argument) দুটি কারণে শ্রেষ্ঠতর হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যেমন : (***i***) অন্যান্য যে সকল প্রমাণে যুক্তি শাস্ত্রগত দুর্বলতা বা ত্রুটি তুলে ধরা হয়েছে এটি অনেকটা তার থেকে মুক্ত। এই প্রমাণে ঈশ্বরকে যুক্তিশাস্ত্রের অবরোহ নিয়মের (Deductive method) আলোকে ব্যাখ্যা করতে চাওয়া হয়নি বলে এর বিরুদ্ধে তেমন অবৈধ ব্যাপ্যতার আপত্তি আনা যায় না। (***ii***) বিশ্বতাত্ত্বিক প্রমাণ, উদ্দেশ্যবাদী প্রমাণ কিংবা অন্য যে প্রমাণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সেখানে এই নৈতিক প্রমাণের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে মানুষের জীবনের নৈতিক দিক থেকে, যা স্থায়ী এবং এর আবেদন চিরন্তন।

নৈতিক প্রমাণ/ যুক্তি/ বক্তব্যসমূহ খন্ডন :

(১) প্রথমেই বলতে হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাথে মানুষের নীতি-নৈতিকতার কোন সম্পর্ক নেই। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায় সমাজবিজ্ঞান (Sociology) ও মনোবিজ্ঞানের (Psychology) সাহায্যে। মনোবিজ্ঞান থেকে জানতে পারি, মানুষের মধ্যে উচিত-অনুচিত, নীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে জ্ঞান প্রধানত জন্মায় শৈশবকাল থেকেই বড়দের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উপদেশ ও অভিভাবনে। শৈশবকাল থেকে শিশুর মধ্যে প্রেরিত উচিত-অনুচিত, নীতি-দুর্নীতিবোধ নিয়ে গবেষণা করেছেন বিখ্যাত শিশুমনোবিজ্ঞানী (Child Psychologist) Piaget। এছাড়া Havard University এর মনোবিজ্ঞানী Kohlberg শিশুদের মধ্যে তার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা মানবীয় গুণাবলি নিয়ে গবেষণা করে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন *The Moral Judgement of the child* (1932) গ্রন্থে। তাঁদের গবেষণা থেকে জানা যায়, সব ছেলেমেয়ের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ একইভাবে গড়ে ওঠে না; বিভিন্ন বয়সের শিশুর মধ্যে নীতি-নৈতিকতা, বিবেকের উন্মেষ, ব্যক্তিত্ববোধ, মূল্যবোধ প্রভৃতি গড়ে ওঠে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিমন্ডল ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবে। ফলে ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুর মধ্যে নীতি-নৈতিকতা ভিন্ন হয়। যেমন, আমাদের সমাজে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের তুলনায় মধ্যবিত্তরা প্রচলিত আদব-কায়দা, উপাসনা-ধর্মীয়রীতি-নীতি, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পালন এবং রক্ষণ করে থাকে বেশি, কারণ উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের থেকে মধ্যবিত্তের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ

ভিন্ন এবং তারা এগুলিকে (আদব-কায়দা, ধর্মীয়রীতি-নীতি ইত্যাদি) সমাজের আবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে।

শিশুমনোবিজ্ঞান বলে থাকে, স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সুস্থশিশুর বয়স যখন দুই তখন সে নিজেকে আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারে, অন্য দ্রব্যাদি থেকে সে যে পৃথক এবং তার বয়সী অন্য শিশুদের সঙ্গেও তার বেশ কিছুটা তফাত আছে এটাও বুঝতে পারে। নিজের কাজ এবং সে কাজের ফল সে কিছু কিছু অনুমান করতে পারে, যেমন একটি ঝুমঝুমি বাজালে যে শব্দ হবে, তার হাতের মাটির খেলনাটি ফেলে দিলে ভেঙ্গে যাবে ইত্যাদি। শিশুর বয়স যখন ৭ থেকে ৯ তখন তার মধ্যে নীতি-দুর্নীতি, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচারের শাস্তি-পুরস্কারের স্তর পেরিয়ে বিবেক বিবেচনার স্তরে উত্তীর্ণ হয়। অল্প বয়সে এই জ্ঞান শাস্তি-পুরস্কার, প্রশংসা-তিরস্কারের স্তরে থাকে। কোন কাজ করে শাস্তি না পেলেই, মনে করে কাজটা নীতিবিরোধী নয়। কোন অবস্থায় কী ধরণের পরিস্থিতিতে কাজটা করা হয়েছিল- এ নিয়ে বিশ্লেষণগত বোধগম্যতা না থাকার জন্য এ বিষয়ে শিশুর সিদ্ধান্তে এরকম ভুলত্রুটি স্বাভাবিকভাবেই ঘটতে পারে। শিশুরা এই বয়সে প্রথমদিকে শাস্তি ও পুরস্কারের দিয়ে ভালমন্দ বিচার শুরু করে। যে কথা বললে বা যে কাজ করলে শাস্তি পায়, সেই কাজকে তারা মন্দ বা খারাপ বলে মনে করে। আর যে কাজ করলে প্রশংসা বা পুরস্কার পায় সেই কাজকে ভাল বলে মনে করে। মা-বাবা অথবা অন্য কেউ বাহবা দিলে বুঝতে পারে সে ভাল কাজ করেছে, অন্যথায় তারা অসন্তুষ্ট হলে বা শাস্তি দিলে মনে করে খারাপ কাজ করেছে। এসময়েই শিশুর আত্মীয়স্বজনেরা শিশুকে উপাসনা-ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা (নামাজ পড়া, রোযা রাখা, পুজো করা ইত্যাদি) সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ক্রমশ জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং বুদ্ধির বিকাশের সাথে শিশুর মধ্যে ভাল-মন্দ-নীতি-দুর্নীতি-পাপ-পুণ্য সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা জন্মায়। নিজের গোষ্ঠী-আত্মীয় বা সমাজের যে কাজের ফলে মঙ্গল ঘটবে বলে তাকে শেখানো হয়, সেইসব কাজকে নীতিগত কাজ বলে মনে করে এবং যেসব কাজে গোষ্ঠী বা সমাজের অমঙ্গল ঘটতে পারে বলে শেখানো হয়, সেইগুলিকে দুর্নীতিমূলক বলে বুঝতে পারে। বারো বছরের মধ্যেই নীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে ধারণা শিশুর মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এসময়ে তার মধ্যে ঈশ্বর, শয়তান সম্পর্কে ভয়-ভীতি, স্বর্গ-নরক নিয়ে লোভ এবং ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যা তার মধ্যে গড়ে ওঠা নীতি-নৈতিকতার সাথে মিশিয়ে ফেলে। এরপর সে কোন দুর্নীতিমূলক কাজে লিপ্ত হলে প্রথমদিকে আত্মগ্লানি অনুভব করে; ভাবতে থাকে সে পাপ করতেছে। কিন্তু যদি দেখে তার সঙ্গীসাথীরা ঐ ধরনের (যা তার মতে দুর্নীতিমূলক) কাজ করে কিছুমাত্র গ্লানিবোধ করছে না, তখন তার স্বনির্ধারিত নীতিজ্ঞানে ফাটল ধরতে পারে। এবং দলের বেশিরভাগ সদস্যই যখন খারাপ কাজ করে কিংবা অশ্লীল আলোচনা করে তখন শিশুর মানসিকবিকাশও সুস্থ-স্বাভাবিক না হয়ে অসুস্থ ও বিপথগামী হয় এবং সে একসময় আর কোনো গ্লানিবোধ করে না। অর্থাৎ বুঝা যায়, পারিবারিক-সামাজিক পরিবেশে সামাজিকীকরন (Socialization) প্রকৃয়ার মাধ্যমেই নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, পাপ-পুণ্যের ভেদাভেদ ইত্যাদি গুণাবলীটুকু কৈশোর পদার্পণের আগেই শিশুর মধ্যে পোক্ত হয়ে যায় এবং এটা নির্ভর করে শিশুর আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের ওপর; যার সাথে অতীন্দ্রিয় সত্তার কোনো অনিবার্য সম্বন্ধ নেই।

(২) ইমান্যুয়েল কান্টের দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে কেবল মাত্র পুণ্য ও সুখের সমন্বয়-কর্তারূপে দেখলে, তাঁকে তাঁর থেকেও বড় কোনো উদ্দেশ্যসাধনের উপায়রূপে গণ্য করা হয়; এবং এর ফলে ঈশ্বরের স্বরূপগত অসীমতা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও ঐক্য ক্ষুণ্ন হয়। এভাবে ঈশ্বরের মহিমা খর্বিত হয়ে যায়। তাছাড়া যেসকল সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক কারণে মানুষের মন ঈশ্বর

বিশ্বাসের দিকে ঝোঁকে, তার কোনো আভাসই এতে পাওয়া যায় না।

(৩) নীতিনৈতিকতা ও উপাসনা-ধর্মের মধ্যে নীতিকে উর্ধ্বে স্থান দিতে গিয়ে ইমান্যুয়েল প্রকান্তরে ঈশ্বরের উপরেও নৈতিক আদর্শটিকে স্থান দিয়েছেন। অথচ, বলা হয়ে থাকে নৈতিক আদর্শটিকে ঈশ্বরই রক্ষা করে থাকেন, যেহেতু তিনি নিজেই পরমমূল্যের মূর্ত প্রতিস্বরূপ।

(৪) পুণ্যকে সুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, কান্টের এমন ধারণা যৌক্তিকভাবে আবশ্যিক নয়। কারণ, কান্ট বলেছেন পুণ্য এমন একটি প্রাজ্ঞিক ইচ্ছা বা শুভ, যেখানে আবেগ, প্রবণতা বা অভিপ্রায়ের স্থান নেই। এবং এই পুণ্যের ধারণা একেক ধর্মে একেক রকম। সমাজ-সংস্কৃতিগত কারণে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ঈশ্বর বিশ্বাসীরা ভিন্ন ভিন্ন কার্যে পুণ্যের ধারণ পোষণ করে থাকেন। কিন্তু মোটামোটি ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সুখের উদ্ভব ঘটে প্রায় এক ভাবে; ব্যক্তির ইচ্ছাপূরণ বা অভিপ্রায় চরিতার্থ করণ থেকে। ব্যক্তি বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা পোষণ করে থাকে এবং সেই সকল ইচ্ছা পূরণ হলেই ব্যক্তি সুখ বা তৃপ্তি লাভ করে থাকে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, পুণ্যকে সুখের সঙ্গে সমন্বিত করা সম্ভব নয়।

(৫) কান্টের মতে, '' ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতিরেকে পুণ্য ও সুখের সমন্বয়বিধান সম্ভব নয়।'' কিন্তু এই বক্তব্যটিও তেমন গ্রহণযোগ্য নয়। ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও পুণ্য ও সুখের সমানুপাতিক সমন্বয় ঘটানো সম্ভব। ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসীরা কী এই দুনিয়ায় তাদের কর্মে সুখী নয়? উপযুক্ত সমাজ-সংস্কৃতি-পরিবেশ, মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতাবোধ এবং মূল্যবোধের প্রতি যথাযথ আস্থার পরিবেশ কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তার শরণাপন্ন না হয়েও নৈতিক উৎকর্ষ অর্জন সম্ভব। এরকম উদাহরণ আমাদের চারপাশেই আছে। আবার ঈশ্বর যদি পুণ্য এবং সুখকে আদৌ সমন্বিত করতে পারেন, তাহলে তিনি ইহলোকে তা না করে পরলোকের জন্য অপেক্ষা করবেন কেন? যে পরলোকের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ এখনও নিঃসংশয়ী নয়?

(৬) কান্টের প্রস্তাবিত যুক্তিতে আরো একটি দুর্বলতা হলো, কান্ট বলেছেন ঈশ্বর কোন নৈতিক আদর্শের স্রষ্টা বা অনুপ্রেরণাদাতা নন; তাঁর একমাত্র কাজ শুধু কর্মের ভালোত্ব ও মন্দত্বের অনুপাতে ফলাফল বন্টন করে দেওয়া। কিন্তু আমরা জানি, কর্মের নৈতিক গুণাবলীটি নির্ভর করে যতটা না বাহ্য ফলাফলের উপর তার থেকে বেশি কর্মকর্তা মানে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বা অভিপ্রায়ের উপর। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্তির ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের উপর নির্ভরশীল ঈশ্বরের ভালো-মন্দের উপর ফলাফল বন্টন। ব্যক্তির ইচ্ছার বাইরে ঈশ্বরের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। তাহলে এখানেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত দার্শনিক যুক্তিসমূহের মাধ্যমে কোনোভাবেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। এরপরও কেউ কেউ খড়কুটো ধরে রাখার মতো করে বলে থাকেন, ''আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ করতে না পারলেও, এটা বলা যায় না, ঈশ্বর নেই।'' এধরণের বক্তব্যে বেশ অনুপপত্তি (Fallacy) রয়েছে। তবে এখন আর এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে বলা যায়, দর্শনশাস্ত্রে ''**Burden of proof**'' বলে বেশ প্রচলিত একটি সুত্র রয়েছে। যার অর্থ : কোন বক্তব্যের দাবিদারকেই সর্বপ্রথম তার বক্তব্য সম্পর্কে প্রমাণ দিতে

হবে। অর্থাৎ "**ঈশ্বরবাদীদেরকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রমাণ দিতে হবে; নিরীশ্বরবাদীদের দিকে এই প্রমাণের দায়িত্ব ঠেলে দিলে চলবে না।**" সবশেষে বিখ্যাত বস্তুবাদী লেখক রাহুল সাংকৃত্যায়নের একটি উক্তি (***তোমার ক্ষয়***; পৃষ্ঠা- ৩৫) ব্যবহার করে এই প্রবন্ধটি শেষ করছি, "**অজ্ঞানতারই অপর নাম ঈশ্বর। আমরা আমাদের অজ্ঞানতাকে স্বীকার করতে লজ্জা পাই এবং তার জন্য বেশ ভারী গোছের একটা নামের আড়ালে আত্মগোপন করি। সেই ভারী গোছের আড়ালটির নামই ঈশ্বর। ঈশ্বর বিশ্বাসের আরও একটি কারণ হল বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের অপারগতা ও অসহায়ত্ব।**"

ধন্যবাদ সবাইকে।

.....সমাপ্ত .....

তথ্যসুত্র :-

(১) আনিন্দ্য আর্য্য; **ঈশ্বর বিতর্ক**; প্রকাশ : ১৯৯৭; আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

(২) আমিনুল ইসলাম; **জগৎ জীবন দর্শন**; প্রকাশ : ১৯৯৫; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(৩) ভবানীপ্রসাদ সাহু ; **ধর্মের উৎস সন্ধানে**; প্রকাশ : ২০০১; উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

(৪) সুকোমল সেন; **ভারতের সভ্যতা ও সমাজবিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ**; প্রকাশ : ২০০০; ন্যাশনাল বুক এজেনসি, কলকাতা।

(৫) **http://www.angelfire.com/mn2/tisthammerw/rlgnphil/ontological.html**

(৬) **http://apologetics.johndepoe.com/morality.html**

(৭) ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়; **শৈশব ও তার সমস্যা**; প্রকাশ : ২০০৪; পাভলভ ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

(৮) রাহুল সাংকৃত্যায়ন; **তোমার ক্ষয়**; প্রকাশ : ২০০৪; চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা।